ভূমিকা

বালুরঘাট শহরে আমার জন্ম নয়, দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম খলসীতে (তপন থানা) আমার জন্ম। খুব দারিদ্র্যতার মধ্য দিয়ে শৈশব ও পড়াশোনার পাঠ শেষ করেছি। ধন্য আমার পিতাঠাকুর (শ্রী রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস) কর্মে সাধারণ 'দরজী' হওয়া সত্ত্বেও আমার জীবনটা নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন। তাই একাদশ শ্রেণীতে পাঠ গ্রহণ কালেই নাটকের শহর বালুরঘাটের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু পড়াশোনা চলাকালীন বালুরঘাটের নাটক আমার দেখা হয়ে উঠেনি। কেবল মাইকের মাধ্যমে প্রচার শুনতাম বালুরঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালে বন্দী (হোস্টেলে) থেকে। কারণ বালুরঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলের অবস্থান বালুরঘাট শহরের মধ্যস্থানে। সেই জন্য সমস্ত খবরই আসতো কানে। মন উতলা হত 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির', 'ত্রিতীর্থ', 'নাট্যতীর্থ', 'গণনাট্য সংঘ' প্রভৃতি নাট্যসংস্থার বিভিন্ন নাটকের অনুষ্ঠান সূচি শুনে। এমনটা হওয়ার অবশ্য কারণ ছিল, শৈশব থেকে আমার ছোট কাকাকে (কালাচাঁদ বিশ্বাস) দেখেছি নাটক, যাত্রার বিভিন্ন চরিত্রের বেশে। খলসী গ্রামে প্রতি দুর্গা পুজোতে এক রাত্রি যাত্রা ও দু'রাত্রি নাটক হতো। নাটকের মান অর্থাৎ অভিনয় আজকের দৃষ্টিতে অতি উন্নত মানের না হলেও গ্রামে নাটকের জোড়ালো হাওয়া ছিল। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে গ্রামের ছেলেমেয়রা অভিনয় করতেন। আমি কখনো অভিনয় করিনি কিন্তু মঞ্চ,অভিনয়,অভিনেতা আমার মনকে খুব স্পর্শ করে। আমার সৌভাগ্য যে চাকুরী সূত্রে খলসী গ্রাম থেকে এসে বালুরঘাটে বসবাস শুরু করি (২০০৭ সাল থেকে)। এই সময় থেকে আমার নাটকের প্রতি অনুরাগ বেড়ে যায়। বিভিন্ন সংস্থার নাটক দেখতাম। মনের মধ্যে বালুরঘাট শহরের নাট্য ঐতিহ্য আমাকে নাড়াদিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণকালে গবেষণার বিষয়ে পরামর্শ চাইলে স্যারদের মুখে বালুরঘাটের নাট্যচর্চার বিষয়টি উঠে আসে। এরপর থেকে আমার মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা প্রবল শক্তি লাভ করতে থাকে। আমার মনে হয় যে, আমি যদি বালুরঘাটের নাট্যচর্চার একটা লিখিত রূপ দিতে পারতাম তাহলে নিজে ধন্য হতাম। কারণ শোনা যায় ১৯০৯ সালের পূর্বেই ১৯০৪ সাল থেকে বালুরঘাটে নাটক অভিনয় হত। ১৯০৯ সালে নাট্য প্রিয়ব্যক্তিরা নাট্যচর্চার একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন 'বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' নামে। সৃষ্টি লগ্ন থেকে অধুনা কাল পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে নাটক অভিনীত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রচুর নাট্যসংস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আবার লুপ্তও হয়েছে। আমার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে- যদি কেউ এই বিষয়টিতে নজর না দেয় তাহলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের অজানা তথ্য সমূহ অজানায় রয়ে যাবে। প্রসঙ্গগত উল্লেখযোগ্য নাটককার ড. মন্মথ রায়কে নিয়ে বিশ্বজুড়ে মাতামাতি হয় কিন্তু তাঁর ধাত্রীমাতা বালুরঘাটের নাট্যচর্চা বাংলা নাটকের কিংবা মঞ্চের আলোচনায় আসে না। বাংলা সংস্কৃতি যেহেতু রাজধানী কলকাতা কেন্দ্রিক তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ কোনো আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টির উপর দৃষ্টিপাতের অপেক্ষা রাখে না। আলোচনায় শোনা যায় উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা, বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ, কালিয়াগঞ্জের ছন্দম, শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী মঞ্চ, মালদার নাট্যচর্চা ইত্যাদি। যেখানে কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্য সংস্থা গুলির ক্ষেত্রে শুধু মাত্র নাট্যসংস্থা (বহুরূপী, নাট্যচক্র, লিটল থিয়েটার, নান্দীকার ইত্যাদি) গুলির নাম উল্লেখ করা হয় কিন্তু কলকাতা ছাড়া অন্যান্য জায়গার নাট্যসংস্থাগুলির নামের আগে স্থানের উল্লেখ করা হয়। সেই কারনে হয়তো সংস্থা গুলি আঞ্চলিক তকমা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারছে না। যদি একটি সংস্থার নাম একাধিক স্থানে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে স্থান নাম উল্লেখ হতে পারে। উক্ত বিষয়টিও আমার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। আমরা একাত্মীকরণ করতে পারিছি না বরং বিকেন্দ্রীকরণে পটু হয়ে উঠেছি।

আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। কেবল প্রাক্তনীই নয় বহুবছর গত হয়েছে আমার বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ কিন্তু আমি পরম ভাগ্যবতী ড. উৎপল মন্ডল মহাশয়ের স্নেহধন্য হয়েছি। আমি অধ্যাপক ড. উৎপল মন্ডল স্যারকে আমার গবেষণার বিষয় বা ইচ্ছের কথা বলতেই তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কারণ তিনিও তো নাটকেরই ব্যক্তি উপরন্তু তিনি নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন। তিনি বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুররের নাট্যচর্চা সম্পর্কে ওয়াকিবহল। এই বৃহৎ কাজটি করতে গিয়ে আমি কিভাবে এগিয়ে যাবো তিনি পথনির্দেশিকা দিয়েছেন। বহুদূর থেকে ছোট শিশুকন্যা সহ আমি যেতাম তাঁর সুপরামর্শ নিতে এবং গবেষণা বিষয়ের লিখিত অংশ বিশেষ দেখাতে। তাঁর ব্যস্তময় কর্মসূচীর মধ্যেও তিনি আমাকে সময় দিতেন এবং উৎসাহ দিতেন। কখনো আমার কাজের গতি প্রকৃতি দেখে বকাবকিও করেছেন যদিও তা কেবল আমাকে ভালোবেসে ও স্নেহ করে। তাঁর তৎপরতায় আমি আমার গবেষণা কর্মটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে পেরেছি।

আমার গবেষণা বিষয়ের নাম ‘‘বালুরঘাটের শতাব্দী প্রাচীন নাট্যচর্চার সেকাল-একাল’’ সময় ধরেছি ১৯০৯ ‘বালুরঘাট নাট্যমন্দির’ (পূর্ব নাম বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) এর প্রতিষ্ঠা বছর থেকে একশো বছর অর্থাৎ ২০০৮ সাল পর্যন্ত। এই বৃহৎ সময় পর্বে বালুরঘাটের নাট্যজগতের উৎকর্ষতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাটককার, উত্থান পতনের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল রূপ লিপিবদ্ধ করেছি ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে। অধ্যায় ছটি নিম্নরূপ-

১. বালুরঘাটের সাধারণ পরিচয়। (আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সংকৃতির প্রেক্ষিতে)
২. প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের নাট্যসংস্কৃতি ও বালুরঘাট।
৩. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ও ত্রিতীর্থ
৪. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ও বালুরঘাটে অন্যান্য দলের অবির্ভাব।
৫. বালুরঘাটের নাটককার ও নাটক
৬. বালুরঘাটের বিশিষ্ট কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক ও নেপথ্যকর্মীর সাধারণ পরিচয়।

বর্তমান বালুরঘাট শহর অতীতে দিনাজপুর জেলার অঙ্গ ছিল। দিনাজপুর জেলা বারবার খন্ডিত হয়েছে। খন্ডিত হয়েছিল তার শিক্ষা সংস্কৃতিও। ১৯৪৭ সালে দিনাজপুর দ্বিখন্ডিত হয়ে তৈরী হয়েছিল দিনাজপুর জেলা (বাংলাদেশ) ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গঠিত হয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভেঙ্গে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছোট্ট জনপথ হল বালুরঘাট শহর। শিক্ষা সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, স্বাধীনতা আন্দোলন সব কিছুতেই দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের ভূমিকা ছিল। শিল্পবিহীন এই জেলা বর্তমানে অর্থনৈতিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা। ১৯০৯ সাল থেকেই বালুরঘাটে নাট্যচর্চা গড়ে উঠেছিল।

১৯০৯ সালে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। ‘হরিরাজ’(সেক্সপীয়রের নাটকরে নাট্যরূপ) দিয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের পথ চলা। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বালুরঘাটে অভিনীত হত মূলত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটক। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু বালুরঘাটের নাটকে তার কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। বাংলা জনমানসে স্বাধীনতা আকাঙ্খায় উন্মুখ মানুষের চাহিদা একমাত্র নাটককার মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’ নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। নাটকটি রূপক, পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে উপস্থাপিত।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবনাট্য আন্দোলন। বাংলার বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক ও অভিনেতা অভিনেত্রীরা 'বহুরূপী' গঠনের মধ্য দিয়ে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। পৃথিবীর আধুনিক নাটকের সাথে বাংলা নাটক দর্শকের পরিচয় করান। মূলত এর হোতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শম্ভু মিত্র, অমর গাঙ্গুলী, ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ। ছয়ের দশকে আরো কিছু নাট্যপ্রিয় ব্যক্তি উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন নাট্যদল গঠন করেন। তাঁরা যেমন বিদেশী নাটকের মঞ্চস্থ করেছেন তেমনি সমসাময়িক সমস্যাও নাটকে ধরা পরেছে। নতুন আঙ্গিক, বিষয়বস্তুর নাটক পরিবেশন করেছে। সবচেয়ে বড় পাওনা সেটা হল শিল্প সুষমার পরিবর্তন ঘটানো। শুরু হল গ্রুপ থিয়েটারের জয়যাত্রা।

ভারত স্বাধীনতা লাভের পর প্রবল হল রাজনৈতিক সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নিরন্ন মানুষের প্রবাহ বঙ্গমানসকে বিদ্ধ করেছিল। নিরন্ন, নিরাশ্রয়, অসহায়, কর্মহীন মানুষের কেউ বালুরঘাটেও এসে লাগল। উদ্বেলিত অস্থির অবস্থা বালুরঘাটের নাট্যজগতেও প্রভাব ফেলেছিল। নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটকের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি সব কিছুতেই নতুনত্বের ছোয়া আনলেন। বালুরঘাটে নবনাট্যের যাত্রা শুরু হল 'তরুণতীর্থের' হাত ধরে। কলকাতার নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে বালুরঘাটও যুক্ত হয়ে পড়ল। নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর নাট্য প্রতিভায় বালুরঘাটকে পরিচয় করেদিলেন ভারতের সঙ্গে। এর পাশাপাশি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরও ছয়ের দশকের শেষ থেকে আটের দশক পর্যন্ত বহু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা করে বালুরঘাটের মান বাড়িয়ে তুলল। সঙ্গে ছিল বহু নাট্যদল তারাও গ্রুপ থিয়েটার ভূমিকা পালন করছে।

বহুদিন পূর্ব থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে 'নাটকের শহর বালুরঘাট'। বাক্যটির সত্যতা ও প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বালুরঘাটে আগত কলকাতার নাট্যব্যক্তিত্ব এসেছেন। তাঁরা নাটক দেখেছেন এবং শিরোপা দিয়ে গেছেন। যেমন-তৃপ্তি মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী, শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল সেনগুপ্ত, শ্যামাকান্ত দাস, অনুসূয়া মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, উষা গাঙ্গুলী প্রমুখ বালুরঘাটের নাটক দেখেছেন। প্রবোধবন্ধু অধিকারীর যুগান্তকারী মন্তব্য করেছিলেন যে কলকাতার জমিদারী ভেঙ্গেছে। কলকাতার সুধী সমাজ বালুরঘাটের নাট্যচর্চার দিকে এবার নজর দিলেন। যদিও সেটা সাতের দশক। কিন্তু এর বহু পূর্ব থেকেই ১৯০৯ সাল থেকে্ যে বালুরঘাটে নাট্যচর্চা ধারাবাহিক ভাবে হয়ে এসেছে তা কলকাতার বুধমন্ডলী কোনো হদিশ পাননি সেটা হয়ত দুর্গম দুরত্বের জন্য। ১৯২৩ সালে বালুরঘাটের পালক পুত্র ড.মন্মথ রায়ের লেখা 'মুক্তির ডাক' কলকাতার নাট্যপিপাসু মানুষদের কাছে এক লহমায় পৌছে দিয়েছিল বালুরঘাটকে তবুও মফ:স্বল বালুরঘাটের স্থান হয়নি বাংলা রঙ্গমঞ্চও নাটকের ইতিহাসে। বর্তমানে ত্রিতীর্থের প্রযোগ প্রধান নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটক লিখেছেন তাঁর নাটকগুলি সমস্তই শিল্পগুণ সমন্বিত। এছাড়াও ৯-১০জন নাটককার নাটক লিখেছেন এবং লিখছেন।

যে কোনো সমৃদ্ধশালী সংগঠনের সার্থক আত্মপ্রকাশ ও পরিশীলিত চিন্তা ধারায় একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল প্রাণশক্তি হল তার যৌথ নেতৃত্বে বা টিম এফোর্ট। নাট্যসংস্থার অভিনেতা অভিনেত্রীরা স্বাভাবিক কারনেই বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। এবং যারা নিরলস নাট্যকর্মী তাদেরও একটা আলাদা স্থান সংস্থায় স্বীকৃতি লাভ করে। লাইটম্যান, মেক-আপম্যান, মিউজিসিয়ান, পোষাক কল্পনাকার এরা পর্দার আড়ালে থেকেই সংস্থার ধারাবাহিক কাজ কর্মে নিজেদের উজার করেছেন। বালুরঘাটের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক নাট্যকর্মী ব্যক্তিদের বয়সানুক্রমিক সাজিয়েছি বটে কিন্তু বহু প্রবীন অভিনেতা ও নাট্যকর্মী যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়টি সংগ্রহ করা যায়নি তাঁদের একটি ভিন্ন উপায়ে প্রবীনতা হিসেব তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। নাট্যমন্দিরে এই সবব্যক্তি কত সালে প্রবেশ করেছে সেই

বর্ষ অনুপাতে তাঁদের পৃথক করে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। আগের দিনে জমিদার শ্রেণী যাত্রাদল বা নাট্যদলকে উৎসাহিত করতেন। জমিদার প্রথা বিলোপ হওয়ার পরে নাট্যশিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বুদ্ধিমান দর্শক শ্রেণী আজ তৈরি হয়েছে। বালুরঘাটও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। ছোট শহর, লোক সংখ্যাও কম তবুও তারা টিকিট কেটে নাটক দেখতে অভ্যস্ত। আমরা জামি দর্শক ছাড়া নাটকের সার্থকতা নেই। সেক্ষেত্রে বালুরঘাটে নাট্য দর্শকের অভাব নেই।

আমার গবেষণার ক্ষেত্রে 'ক্ষেত্রসমীক্ষা'য় দেখা গেছে বালুরঘাটের বেশির ভাগ মানুষই ছোট বড় অভিনেতা। যদিও আমার বক্তব্যটি অতিভাষণ বলে মনে হবে। কিন্তু এটি সত্য যে বেশির ভাগ পরিবারের কেউ না কেউ কোনো না কোনো ভাবে নাটকের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো কাজে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। তাই আমার আলোচনার স্বল্প পরিসরে অনেক অভিনেতা ও নাট্যকর্মী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারিনি এটা আমার ব্যর্থতা।

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে কোনো তথ্য সংরক্ষিত নেই। 'তথ্যবহি' টি হারিয়ে গেছে বা কোনো অসৎ ব্যক্তি গোপন করেছে, তাই নাট্য মন্দিরের ক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রত্যক্ষদর্শী এবং কিছুটা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে জনশ্রুতির বিষয় গুলি ইতিহাস সাপেক্ষে মেলানোর চেষ্টা করেছি।

আমার গবেষণাকৃত বিষয়টি উপস্থাপন করা আমার পক্ষে ছিল অত্যন্ত দূরহ কিন্তু স্বীকার করবো বালুরঘাটের নাট্যপ্রিয় প্রতিটি ব্যক্তি যাঁদের কাছে আমি তথ্যসংগ্রহে গিয়েছি তাঁরা সকলে তথ্য প্রদান ও সুপরামর্শ দিয়েছেন। গবেষণাকর্মে যাঁরা আমাকে আপ্রাণ সাহায্য করেছেন এবং আমি বহুবার গিয়েছি যাঁদের কাছে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে কৃতঘ্ন হব আমি। কমল দাস, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, দীপক রক্ষিত, অরিন্দম চক্রবর্তী, হারাণ মজুমদার, প্রদোষ মিত্র, অজিত মহন্ত, রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর সরকার, প্রণব মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, শুভাশীষ গোস্বামী, প্রেস ক্লাব লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান উদয় শঙ্কর দাস, জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অনুপ মন্ডল তথ্য দানে সাহায্য করেছেন। দীর্ঘগবেষণাপর্বের আমার স্বামী অবসর প্রাপ্ত সমরকর্মী সমীর কুমার দাস প্রতিটি মূহুর্তে আমার মানসিক শক্তি সঞ্চার করেছেন। উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার তত্ত্বাবধায়ক স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় তিনি হতেন আমার নিত্য সঙ্গী।

ভ্রাতৃসম জয়দেব চন্দ্র বর্মন যে সারাদিন মোহরীর কাজ করেও আমার লেখাগুলিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাপার অক্ষরের মর্যাদা দিয়েছে। উক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে গবেষণা কাজে সাহায্য করেছেন এবং প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার সহ বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমার ঋনের অন্ত নেই।